১৯৭১ সালে বড়াইগ্রাম গণহত্যা ঃ একটি জরিপ

সুমা কর্মকার *

সারসংক্ষেপঃ এই প্রবন্ধে ১৯৭১ সালে নাটোর জেলার বড়াইগ্রামের গণহত্যার চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে। নাটোর সদর উপজেলার দক্ষিণে অবস্থিত বড়াইগ্রাম উপজেলা। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের সহযোগী দালাল আলবদর,আলশামস প্রভৃতি এ উপজেলার বিভিন্ন স্থানে বহু নিরীহ মানুষদের হত্যা করেছিল। কখনও একটি পরিবারের সকলে, কখনও কয়েকজন, এভাবে বহু মানুষ গণহত্যার শিকার হয়েছিল তাদের দ্বারা। যার সাক্ষী গণকবর,বধ্যভূমি প্রভৃতি আজও বিদ্যমান। তৎকালীন পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে অনেক তথ্যই বিস্মৃত হয়েছে। তবুও এই প্রবন্ধে চেষ্টা করা হয়েছে বড়াইগ্রাম উপজেলার গণহত্যাগুলোর চিত্র ফুটিয়ে তোলার।

সূচক শব্দ ঃ গণহত্যা, পাকিস্তানি বাহিনী, নির্যাতন, দালাল, রাজাকার, আলবদর, ক্যাম্প, হানাদার, বেয়োনেট, গুলি।

ভূমিকা

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসরদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এ অঞ্চলটিও এর ব্যতিক্রম ছিলনা। এ উপজেলার মানুষেরা বুঝতে পেরেছিল পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী কখনই বাংলাদেশের স্বাধীনতা স্বীকার করবে না। ফলে অন্যান্য অঞ্চলের মত তারাও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর উপর। তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংগঠিত হতে থাকে পাকিস্তানি শাসকদের মোকাবেলা করতে। ফলে তাদের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে স্বাধীনতাবিরোধী পাকিস্তানি বাহিনীর সমর্থক রাজাকার, আলবদর প্রভৃতি ঘাতক দালাল। তারা এই উপজেলায় গণহত্যায় পাকিস্তানিদের সক্রিয়ভাবে সহায়তা করে। পাকিস্তানিরা ১১ এপ্রিল বড়াইগ্রামে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে এবং স্থানীয় দালাল রাজাকার তথা ঘাতক-দালালদের সঙ্গে মিলিত হয়ে হত্যা, নির্যাতনে মেতে উঠে। মূলত পাকিস্তানি মেজর গিয়াসউদ্দিন চৌধুরীর নেতৃত্বে ক্যাপ্টেন রশিদ, জাহাঙ্গীর পারকোল, নটাবাড়িয়া প্রভৃতি গ্রামসহ পুরো বড়াইগ্রাম দখল করে ও ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করে।

'গণহত্যা' শব্দটি সাধারণভাবে বোঝায় অনেক মানুষকে গণহারে নির্বিচারে হত্যা করা। শব্দটির প্রাথমিক অর্থ থেকে আমরা এ ধারণা পাই। 'গণহত্যা' শব্দটি বাংলায় ব্যবহার করা হয় ইংরেজি-জেনোসাইড (Genocide)এর অনুবাদ হিসেবে। পোল্যান্ডের আইনজ্ঞ লেমকিন বলেছেন একটি জাতি, সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীকে সম্পূর্ণ বা আংশিক নির্মূলের জন্য যে হত্যাকান্ড পরিচালিত হয় সেটি 'জেনোসাইড'(শাহরিয়ার কবির ২০১৫: ৩)। আন্তর্জাতিক আইনে জেনোসাইড বা গণহত্যা কথাটির অর্থ হল কোন সরকার দ্বারা

* সহকারি অধ্যাপক (ইতিহাস), এসএসএইচএল, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো জাতিগত, ধর্মীয় বা গোত্রীয় দলভুক্ত জনগণের বিনাশ করা(ফজলুর রহমান ২০০০: ১১)। এই সংজ্ঞা অনুসারে ১৯৭১ সালে বড়াইগ্রামে গণহত্যা সংঘটিত হয়েছিল।

সাহিত্য পর্যালোচনা

নাটোর জেলা নিয়ে গবেষণা ও লেখালেখির পরিমাণ খুব বেশি নয়। বড়াইগ্রাম উপজেলার গণহত্যা সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থ, পত্রপত্রিকায় কিছু তথ্য জানা যায়। তবে অধিকাংশ গ্রন্থেই এ উপজেলার গণহত্যার আংশিক বর্ণনা পাওয়া যায়। অধ্যাপক সুজিত সরকারের *নাটোর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস* বইটি নাটোর জেলার সামগ্রিক মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত প্রথম একটি গ্রন্থ। এ গ্রন্থে নাটোর জেলার বিভিন্ন গণহত্যা সম্পর্কে জানা যায়। বড়াইগ্রামের বনপাড়া মিশন, নটাবাড়িয়া কালির ঘুন গণহত্যা, পাঁচবাড়িয়া, হারোয়া প্রভৃতি গণহত্যা সম্পর্কে এ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। পারকোল গণহত্যা সম্পর্কে আলাদা ভাবে বর্ণনা নেই, তবে ধানাইদহ প্রতিরোধ যুদ্ধের বর্ণনায় এটি সম্পর্কে বর্ণনা আছে। প্রতিটি গণহত্যার বর্ণনাতেই গণহত্যা ও শহীদদের পরিচয় সম্পর্কে তথ্য আংশিক।

সুকুমার বিশ্বাসের *একাত্তরের বধ্যভূমি* গ্রন্থে নাটোর জেলার ৪টি গণহত্যার বর্ণনা রয়েছে, যার অধিকাংশই আংশিক বর্ণিত। এখানে বড়াইগ্রামের শুধু বনপাড়া মিশন গণহত্যা সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যেখানে পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণ, অত্যাচার প্রভৃতির বর্ণনা রয়েছে। এছাড়া অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত *মুক্তিযুদ্ধ কোষ* (২য় খণ্ড), হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিলপত্র(*অষ্টম খণ্ড), বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সম্পাদিত- *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*(৬ষ্ঠ খণ্ড) ও সাঈদ বাহাদুর রচিত *গণহত্যা ও বধ্যভূমি-৭১* গ্রন্থে বনপাড়া মিশন গণহত্যা সর্ম্পকে আংশিক বর্ণনা রয়েছে। এছাড়া অধ্যাপক আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন সম্পাদিত *মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস* (২য় খণ্ড) গ্রন্থে নাটোর জেলার মুক্তিযুদ্ধের আংশিকচিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এ গ্রন্থে ৭-৮ টি গণহত্যার কথা উল্লেখ করা হয়েছে,তবে বড়াইগ্রামের গণহত্যার কোন বর্ণনা নেই।

গবেষণা পদ্ধতি

প্রাথমিক উৎস, দ্বৈতয়িক উৎস, পত্র-পত্রিকা, প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ, গণকবর, বধ্যভূমি, নির্যাতন কেন্দ্র প্রভৃতির ভিত্তিতে আলোচ্য প্রবন্ধটি সম্পাদনের প্রচেষ্টা করা হয়েছে। এই গবেষণাকর্মটি সম্পাদনের জন্য সাক্ষাৎকার পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শী ও ভুক্তভোগীদের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে গণহত্যার তীব্রতা ও ভয়াবহতা সম্পর্কে জানা গিয়েছে। এছাড়া গৌণ বা দ্বৈতয়িক উৎস হিসেবে বিভিন্ন গ্রন্থ, স্মরণিকা, ওয়েবসাইট প্রভৃতির সহযোগিতা নেয়া হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য যাচাই-বাছাই করে প্রবন্ধটি রচনা করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের বিবরণ অনেক গ্রন্থেই রয়েছে। বড়াইগ্রাম উপজেলার গণহত্যা বিষয়ে গ্রন্থের সংখ্যা কম ও বর্ণনা আংশিক। এ উপজেলার মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক ধারনা প্রদানের প্রচেষ্টা করা হয়েছে। এই উপজেলার মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক অনেক তথ্য বিলুপ্ত হয়ে গেছে। মাঠ পর্যায়ে কাজ

করতে গিয়ে তার প্রমাণ পেয়েছি। অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয়দের জিজ্ঞাসা করে তথ্য পাওয়া যায়নি। এই উপজেলার ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ মানুষের ভূমিকা, গণহত্যা, গণকবর, নির্যাতন প্রভৃতি বিভিন্ন তথ্য আজও রয়েছে অজানা। এছাড়া প্রত্যক্ষদর্শীরা, নির্যাতিতদের সবাই বেঁচে নেই। যাঁরা আছেন তাঁরাও বয়স্ক, কারও স্মৃতিশক্তি প্রায় শেষ পর্যায়ে। তাই এ বিষয়গুলো সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তথ্য লিপিবদ্ধ না হলে আগামী প্রজন্মের কাছে অজানাই থেকে যাবে আত্মত্যাগ। এ কারণে এ অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধে গণহত্যা, নির্যাতন যা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের সহযোগীরা করেছিল সে বিষয়ে কাজ করতে উৎসাহিত হয়েছি।

বড়াইগ্রাম উপজেলার ভৌগলিক অবস্থান

জনসংখ্যার দিক দিয়ে এটি নাটোর জেলার তৃতীয় বৃহত্তম উপজেলা। বড়াইগ্রাম থানা গঠিত হয় ১৮৬৯ সালে এবং উপজেলা হিসেবে রূপান্তর ঘটে ১৯৮৩ সালে। বড়াইগ্রাম উপজেলার নামকরণ সম্বন্ধে নির্দিষ্ট কিছু জানা যায় না। এ উপজেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে বড়াল নদীর দু'টি শাখা। উপজেলার অধিকাংশ গ্রামই বড়াল নদীর দুইধারে অবস্থিত। সে কারণে একে বড়ালগ্রাম বলা হত। কালক্রমে বড়াল নদী থেকেই বড়াইগ্রামের উৎপত্তি হয়েছে। এককালের খালে ভরা জঙ্গলাবৃত স্থানটুকুই বর্তমানে বড়াইগ্রাম নামে পরিচিত(জেলা বাতায়ন (http://baraigram.natore.gov.bd)। এ উপজেলার আয়তন ২৯৯.৬১ বর্গ কি.মি.। এ উপজেলার অবস্থান যথাক্রমে ২৪°১০ এবং ২৪°২১ উত্তর অক্ষাংশ এবং যথাক্রমে ৮৮°০১ এবং ৮৯°১৭ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। এ উপজেলার উত্তরে গুরুদাসপুর এবং নাটোর সদর উপজেলা। পূর্বে পাবনা জেলার চাটমোহর উপজেলা, দক্ষিণে নাটোর জেলার লালপুর এবং পাবনা জেলার আটঘরিয়া ও ঈশ্বরদী উপজেলা ও পশ্চিমে নাটোর জেলার বাগাতিপাড়া উপজেলা(সিরাজুল ইসলাম ২০১১:২৯৯-৩০০)। ১৯৭৪ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বড়াইগ্রাম উপজেলার জনসংখ্যা ছিল ১৪০৭৯৮ জন (*গ্রাম জনসংখ্যা পরিসংখ্যান ১৯৭৪ : ১৫৬)* এবং বর্তমানে ২৪৪৮২১ জন(২০০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী)। এই উপজেলায় পৌরসভা রয়েছে ২টি, ইউনিয়ন রয়েছে ৭টি এবং নদী রয়েছে বড়াল ও মরা বড়াল(সিরাজুল ইসলাম ২০১১ : ২৯৯-৩০০)।১৯৭১ সালে এই উপজেলার মাঝগাঁও ইউনিয়নের অন্তর্গত নটাবাড়িয়া গ্রাম, নগরইউনিয়নের অন্তর্গত পারকোল, ধানাইদহ গ্রাম, গোপালপুর ইউনিয়ন ও বনপাড়া পৌরসভায় গণহত্যা সংঘটিত হয়েছিল।

স্থানীয় পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি

বড়াইগ্রামের মূলাডুলি স্কুল মাঠে আনসার সদস্য হযরত আলী, আলী আযম এবং পাকিস্তানি সেনাবাহিনী থেকে ছুটি ভোগ করতে আসা বাঙালি সৈনিক আবু মোহাম্মদ প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। রফিকুল ইসলাম, আমজাদ হোসেন প্রমুখ সংগঠকেরা বিভিন্ন গ্রাম থেকে যুবকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতেন (সুজিত সরকার ২০০৯ : ১৩৭)। এভাবে বড়াইগ্রামবাসী স্বাধীনতা অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা চালাতে থাকে।১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ভাষণে অনুপ্রাণিত হয়ে বড়াইগ্রাম উপজেলার জনগণও মুক্তির আদর্শের প্রেরণা লাভ করেছিল। নিজ এলাকায় প্রতিরোধ গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ থানায় সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয় মার্চ মাসেই।

শান্তি কমিটি গঠন

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরুর অব্যবহিত পরে বড়াইগ্রাম উপজেলায় বাংলাদেশের কতিপয় স্বাধীনতা বিরোধী ব্যক্তিবর্গ এলাকায় নিরাপত্তা রক্ষার মুখোশ পড়া একটি কমিটি গঠন করে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীকে সাহায্য করার জন্য। এটা হল শান্তি কমিটি। প্রায় প্রতিটি ইউনিয়ন পর্যায়ে শান্তিকমিটির নেতৃত্বে ছিলেন একেকজন দালাল।

সংঘর্ষের সূত্রপাত

১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি বাহিনী যে নির্মম হত্যা ও ধ্বংসের ত্রাস সৃষ্টি করেছিল, তা অব্যাহত ছিল ডিসেম্বর ১৯৭১ পর্যন্ত। দীর্ঘ ৯ মাসের নরকযন্ত্রণাময় জীবন অতিবাহিত করতে হয়েছে নাটোরবাসীদের। নাটোরে বিহারী ও বাঙালি সংঘর্ষের প্রভাব বড়াইগ্রাম উপজেলাতেও পড়েছিল। লালপুর থানার ময়না যুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্য যুদ্ধে বড়াইগ্রামবাসীও যোগ দিয়েছিল। ১১ এপ্রিল পাকিস্তানি বাহিনী নগর ইউনিয়নের সন্দেহ ব্রিজ দিয়ে প্রবেশের চেষ্টা করলে স্থানীয়রা প্রতিরোধ করে। এখানে কয়েকজন ই.পি.আর বাহিনীর লোক ও ছিল। তারাও প্রতিরোধ করে। তবে পাকিস্তানি বাহিনীর গুলিতে তাঁরা মারা যান। এছাড়া বড়াইগ্রাম থেকে মার্চ এপ্রিল মাসের মধ্যে প্রায় ১০০ জনকে ধরে নিয়ে যায়। তাদের মধ্যে ৯৯ জন শহীদ হন, ১জন বেঁচে যান। এভাবে শুরু হয় হত্যাযজ্ঞ। পরবর্তীতে পারকোল, নটাবাড়িয়া কালির খুন, কালিকাপুর, বনপাড়া প্রভৃতি স্থানে রাজাকার, আলবদর ও পাকিস্তানি বাহিনীর হত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ করে। এসব স্থান থেকে বহু লোককে ধরে নিয়ে গিয়ে কয়েন বাজার ক্যাম্পে নির্যাতন করে। অনেককে নাটোর ক্যাম্পেও ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে হত্যা করা হয়। বহু নারীকে ধর্ষণ করে পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দালালদের সহযোগিতায় পাকিস্তানি ঘাতক হানাদাররা মহিলাদের ধরে নিয়ে গিয়ে ক্যাম্পে আটক রেখে পাশবিক নির্যাতন করে ছেড়ে দিত, কোন কোন ক্ষেত্রে হত্যা করত। হত্যা, ধর্ষণের পর তারা লুটপাট করত ও অগ্নিসংযোগ করে বাড়িঘর পুড়িয়ে দিত। কোন কোন ক্ষেত্রে গবাদি পশুও নিয়ে যেত। বনপাড়া মিশনে আশ্রয় নিয়েছিল লালপুর উপজেলার বহু মানুষ। পাকিস্তানি বাহিনীকে সে খবর দেয় রাজাকার আলবদর ও শান্তিকমিটির লোকেরা। ফলে পাকিস্তানি সৈন্যরা এসে বহু নর-নারীকে ধরে নিয়ে গিয়ে নাটোর শহরে হত্যা, নির্যাতন, নারীদের ধর্ষণ করে। এসব নারীদের মধ্যে যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁরা এখনও বয়ে চলছে দুর্বিষহ স্মৃতি আর যন্ত্রণাময় জীবন।

পাকিস্তানি বাহিনীর ক্যাম্প

১৯৭১ সালে অন্যান্য উপজেলার মতো এ উপজেলারও বিভিন্ন স্থানে রাজাকার, আলবদর তথা দালাল চক্র ও পাকিস্তানি বাহিনী নিজেদের আস্তানা করেছিল। তবে এ উপজেলার কয়েন বাজার ক্যাম্প উল্লেখযোগ্য। এখানে পাকিস্তানিরা বহু লোককে ধরে এনে নির্যাতন করত।

প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্যে বড়াইগ্রাম উপজেলার গণহত্যা ও নির্যাতনের বিবরণ

১০ এপ্রিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী পাবনা দখল শেষ করে মুলাডুলি রেল গেইটের মধ্য দিয়ে নাটোর এর দিকে রওয়ানা দেয়। কিন্তু মুলাডুলিতে প্রতিরোধের সম্মুখীন হয় এবং স্থানীয় অনেক মানুষকে হত্যা

করে হানাদাররা। এরপর মুলাডুলি রেল গেইট থেকে আনুমানিক তিন কিলোমিটার উত্তরে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ধানাইদহ নামক স্থানে ব্রিজের কাছে এসে পুনরায় প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। উল্লেখ্য, বড়াইগ্রাম লালপুর এবং পাবনার উত্তর সীমান্তের জনগণ ধানাইদহ ব্রিজ ভাঙার কাজে লিপ্ত ছিলেন যেন পাকিস্তানি হানাদাররা নাটোরের দিকে অগ্রসর হতে না পারে। কিন্তু বড়াইগ্রাম উপজেলার রাজাকারদের সাহায্যে পাকিস্তানি মেজর গিয়াসউদ্দিন চৌধুরী, ক্যাপ্টেন রশীদ ও জাহাঙ্গীর এর নেতৃত্বে হানাদার বাহিনী সরাসরি ব্রিজের রাস্তা ব্যবহার না করে সেটি থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে তাদের কনভয় নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে(সুজিত সরকার ২০০৯ : ১৫০-১৫১)। ১০ এপ্রিল রাতটি অপেক্ষা করে ১১ এপ্রিল তারা ধানাইদহের পূর্ব দিক দিয়ে বয়ে যাওয়া কাঁচা রাস্তা দিয়ে পারকোল পাঁচবাড়িয়া হয়ে ব্রিজের সমান্তরাল পথ অতিক্রম করে উত্তর-পূর্ব দিক থেকে নাটোর রোডে উঠে ব্রিজ ভেঙ্গে-যারা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করছিল তাদের আক্রমণ করে। এখানে বেশ কয়েকজন স্থানীয় ও ই.পি.আর সদস্য শহীদ হন হানাদারদের গুলিতে। এরপর হানাদার বাহিনী বিকল্প রাস্তা দিয়ে নাটোরের পাকা সড়কে পৌঁছার সময় পারকোল, পাঁচবাড়িয়া গ্রামে হত্যাযজ্ঞ চালায়। পারকোল গ্রামটি হিন্দু-অধ্যুষিত ছিল। হানাদার বাহিনী গ্রামগুলোর মানুষদের মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগী মনে করে তাদের বাড়িঘর এ আগুন ধরিয়ে দেয়।

আব্দুল জলিল সরকার জানান,
মাগরিবের একটু আগে পারকোল গ্রামের প্রায় সব বাড়িতেই আগুন ধরিয়ে দেয় হানাদাররা। এই গ্রামের ছবির উদ্দিন ও তাঁর আত্মীয় স্বজন সহ একই পরিবারের প্রায় ১০জন সদস্য ও প্রতিবেশী সহ প্রায় ২১ জনকে গুলি করে হত্যা করে। শিশু, বৃদ্ধ, মহিলা, পুরুষ কেউ বাদ যায়নি। অনেকেই হানাদার বাহিনী গ্রামে ঢুকেছে শুনে পালিয়ে গিয়েছিল। যারা ছিল তাদের অনেকে আশে পাশে জঙ্গলে লুকিয়েছিল। ছবির উদ্দিনের ভাইয়ের স্ত্রী জয়নব বিবি ও তাঁর কোলে থাকা শিশুপুত্র জাহাঙ্গীর আলমকে হানাদাররা গুলি করে হত্যা করে। অনেকে শরীরে গুলি লেগে পঙ্গুত্ব লাভ করেছে। ছবির উদ্দিনের আরেক আত্মীয় ধানাইদহ থেকে আসা রঙ্গলালকে পুড়িয়ে হত্যা করে ঘাতকরা(সাক্ষাৎকার : আব্দুল জলিল সরকার)।

সাজদার রহমানের ছেলে শাহাদাৎ মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিল জানতে পেরে পুরো পরিবারকে হত্যা করে হানাদাররা। প্রায় ৬জন নিরীহ প্রাণ বলি হয় তাদের হাতে। পাঁচবাড়িয়া গ্রামেও হত্যা লুটপাট অগ্নিসংযোগ করে। এ গ্রামেও প্রায় ৯-১০ জন লোককে হত্যা করে ঘাতক বাহিনী। ধানাইদহ, পারকোল, পাঁচবাড়িয়াতে হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে তারা লুটপাট করে পুরো বড়াইগ্রাম দখলের চেষ্টা করে। এরপর ২০ এপ্রিল হানাদার বাহিনী বনপাড়ার আশেপাশে আসে। বিভিন্নভাবে গুলি চালালে হারোয়াতে ৪ জন লোক মারা যায়। এরপর মাঝে মাঝেই পাকিস্তানি সৈন্যরা হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। বনপাড়ার মিশন হাসপাতালে বিভিন্ন স্থান থেকে আসা বহু মানুষ আশ্রয় নিয়েছিল। স্থানীয় রাজাকাররা এবং দালালরা হিন্দুদের ওপর নির্যাতন ও বাড়িঘর লুটপাট শুরু করলে সেসব মানুষ জীবন রক্ষার তাগিদে এই খ্রিষ্টান মিশনারী বা ওপার বাংলাকেই নিরাপদ বলে মনে করেছিল। যারা পালাতে পেরেছিল পালিয়েছে ভারতে, কিন্তু যারা থেকেছে, তাদের অনেকেই আশ্রয় নিয়েছে মিশনে। পাকিস্তানি মেজর শেরওয়ানীর নেতৃত্বে বেশ কয়েকবার বনপাড়া মিশনে আক্রমণ করেছে হানাদার বাহিনী। নাটোরের কুখ্যাত ঘাতক হাফেজ আব্দুর রহমানও সাথে ছিল হানাদারদের। মিশনের ধর্মযাজক ফাদার পিনস ও গ্যাবলিব আশ্রিতদের প্রাণভিক্ষা চাইলেও তা দেয়নি

হানাদাররা। মিশনে আশ্রিত বহু নারী পুরুষদের তারা ধরে নিয়ে যায় ও নির্যাতন-হত্যা করে। কেউ পালাতে চেষ্টা করলে সেই মিশনেই নির্যাতন করে, অবশেষে গুলি করে হত্যা করে। কাউকে বেয়োনেট চার্জ করে। মিশন থেকে কয়েকবার (কখনও ৮৬ জন, কখন ৬ জন) ধরে নিয়ে হত্যা করে ঘাতক বাহিনী। ৩রা মে এখান থেকে প্রায় ৮৬ জনকে ধরে নিয়ে নাটোর ফতেঙ্গাপাড়া (দোয়াতপাড়ার অদূরে) নামক স্থানে হত্যা করে। বড়াইগ্রাম থেকে প্রায় ১০০ জনকে কয়েন বাজার ক্যাম্পে নিয়ে হত্যা করে। এটি এপ্রিল মাসের ঘটনা। বড়াইগ্রাম থানার নটাবাড়ীয়া মৌজার কালির ঘুন নামক স্থানে সুশীল ও বিশ্বনাথ (জোয়ারী ইউনিয়নের) নামক হিন্দু দু'জন ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে গুলি করে হত্যা করে এবং ট্রাক চাপা দেয় বলে জানান রহিম বক্স(সাক্ষাৎকার : রহিম বক্স)।

এছাড়া কালিকাপুর নামক স্থানে (নাটোর বড়াইগ্রাম সড়কের পার্শ্বে) বহু মানুষকে হত্যা করে ফেলে রেখেছিল বলে জানান মুক্তিযোদ্ধা মোঃ শামসুল হক (বড়াইগ্রাম মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার)। জোয়াড়ী ইউনিয়নে অনেকেই মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিল। ফলে এ এলাকার কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রীকে হানাদার বাহিনী ধরে নিয়ে যায় নাটোর ক্যাম্পে। সেখানে নির্যাতন শেষে তাঁদের আহত অবস্থায় পরে ফেলে রেখে যায় গ্রামে।

এছাড়া পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরও অত্যাচার করেছে। কৃষক মুনির উদ্দিনকেও ধরে নিয়ে গিয়ে অত্যাচার করেছে বলে জানান তিনি। হাবিবুর রহমানকে ক্যাম্পে নিয়ে বুকে পাথর বেঁধে অত্যাচার করা হয়েছিল প্রায় ৭-৮ দিন ধরে। পুরো বড়াইগ্রামে যুদ্ধকালীন ৮-৯ মাসে হত্যা, নির্যাতন, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি অব্যাহত ভাবে চলেছে রাজাকার আলবদরদের সহযোগিতায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নেতৃত্বে। তারপরও এলাকার মানুষ মুক্তিযোদ্ধাদের দিকে সহযোগিতার হাত অব্যাহত রেখেছেন। খাদ্য, আশ্রয় সহ বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছে নিজেদের প্রাণ বিপন্ন করে(সাক্ষাৎকার : মুক্তিযোদ্ধা মোঃ শামসুল হক)।

বড়াইগ্রাম উপজেলার গণহত্যা

নিম্নে বড়াইগ্রাম উপজেলার গণহত্যাগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হল ঃ

ধানাইদহ গণহত্যা

মুলাডুলি থেকে আনুমানিক তিন কিলোমিটার উত্তরে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এগুতেই ধানাইদহ নামক স্থানে মৃত নদীর ওপর নির্মিত ব্রিজে এসে প্রতিরোধের সম্মুখীন হয় ১০ এপ্রিল বিকেলে। এতে স্থানীয় জনগণ ও ই.পি.আর কয়েকজন সদস্য ধানাইদহ ব্রিজ ভেঙ্গে দিয়ে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। ধানাইদহ ব্রিজে এসে হানাদার বাহিনী স্থানীয়দের প্রতিরোধ ভেঙ্গে দেয়। এতে ই.পি.আর সদস্য ও স্থানীয় কয়েকজন শহীদ হয়। এছাড়া স্থানীয় কয়েকজনকেও হত্যা করে হানাদার বাহিনী।

পারকোল গণহত্যা

১৯৭১ সালের ১১ এপ্রিল ধানাইদহ ব্রিজ দখল করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ব্রিজের নিকটবর্তী গ্রাম গুলোতে আক্রমণ করে বিহারী দালালদের সহায়তায়। ধানাইদহ ব্রিজ থেকে পূর্ব দিকের কাঁচারাস্তা ধরে

পারকোল গ্রামে যাওয়ার রাস্তা। নগর ইউনিয়নের এই গ্রামে হানাদার বাহিনী বিকেলের দিকে আক্রমণ করে। পারকোল গ্রামটি হিন্দু অধ্যুষিত হলেও মুসলমানদের বেশ কিছু পরিবার ছিল। হানাদার বাহিনী নাটোর প্রবেশ করেছে শুনে বহু পরিবার অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছিল। যারা থেকে গিয়েছিল তারা ঘাতক বাহিনীর কোপানলে পড়েছিল। দালালদের সহযোগিতায় পাকিস্তানি বাহিনী পুরো গ্রাম আক্রমণ করে অগ্নিসংযোগ করে। ভয় পেয়ে অনেকেই লুকায় জঙ্গলে। উল্লেখ্য, স্থানীয় দালালরা পাকিস্তানি বাহিনীকে জানিয়েছিল, এ গ্রামের লোকজন মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করেছে। ধানাইদহ প্রতিরোধে তারাও জড়িত। এ কারণেই মূলত হানাদার বাহিনী এসেছিল এ গ্রামে(সুজিত সরকার ২০০৯:১৫০)।

পারকোল গ্রামের ছবির উদ্দিন ও তাঁর পরিবারের প্রায় ১০-১১ জন সদস্যকে হত্যা করে গুলি করে। একই গ্রামের সাজদার রহমান ও তাঁর পরিবারের ৬ জন সদস্যকে হত্যা করে। হিন্দু মনোরঞ্জন শীল ও বৈষ্ঠমী সহ এ গ্রামের প্রায় ২০-২৫ জন সদস্যকে হত্যা করে ঘাতক-দালালরা।

শহীদ ছবির উদ্দিন সরকার ও তাঁর পরিবার ঃ ১৯৭১ সালে ১১ এপ্রিল নগর ইউনিয়নের পারকোল গ্রামে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আক্রমণ করে এবং নিরীহ বহু মানুষকে হত্যা করে। তাঁদের শিকারে পড়ে ছবির উদ্দিন ও তাঁর পরিবারের প্রায় ১০-১১ জন মানুষ প্রাণ হারায়।ছবির উদ্দিনের পিতার নাম আজিম সরকার। ছবির উদ্দিন সরকার ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁর স্ত্রী, কন্যা, সহ আরও আত্মীয় স্বজন প্রাণ হারান। তাঁরা হলেন ঃ

১.গোলাপী (ছবির উদ্দিনের স্ত্রী), ২. জালেমা খাতুন (ছবির উদ্দিনের কন্যা), ৩. মাজেদ আলী (পিতা: বাদশা মিয়া) (বোনের ছেলে, কৃষিকাজ করতেন), ৪. শুকুর আলী (ছবির উদ্দিনের ভাই, কৃষক ছিলেন), ৫. জান মোহাম্মদ (শুকুর আলীর ছেলে), ৬. জয়নব বিবি (স্বামী: মজিরুদ্দিন মিয়া) (ছবিরের ভাবী), ৭. জাহাঙ্গীর আলম (পিতা: মজিরুদ্দিন মিয়া) (ছবিরের ৪ বছরের ভ্রাতৃষ্পুত্র),৮. ইলিম শাহ, ৯. আছের উদ্দিন (পিতা: আন্তুল সরকার), ১০. বেগুনী (স্বামী-আজিম উদ্দিন সরকার)(ছবির উদ্দিনের মা), ১১. রঙ্গলাল এবং ১২. ছবির উদ্দিন নিজে শহীদ হন। উল্লেখ্য ছবির উদ্দিনের আরেক ভ্রাতৃষ্পুত্র কানু সরকার আহত হন।

মাজেদ আলী ঃ মামা ছবির উদ্দিনের বাড়ি থাকতেন। তিনি কৃষিকাজ করতেন। পিতার নাম বাদশা মিয়া।

আছের উদ্দিন ঃ হানাদার বাহিনী এলে তিনি সকলকে সাবধান করেন যারা লুকিয়েছিল পাশের জঙ্গলে। বলেন, 'তোরা উঠিস নারে, গুলি করে মেরে দিবে'। কিন্তু তিনি নিজেই গুলি লেগে প্রাণ হারান।

মনোরঞ্জন শীল ঃ পিতা: মাখনচন্দ্র শীল। মনোরঞ্জন নাপিত ছিলেন। বাড়ির সবাই নিরাপদ আশ্রয়ে গেলেও তিনি যাননি। জানালার কাছে বসেছিলেন, হানাদার বাহিনী তাঁর বাড়িতে ঢুকে গুলি করে হত্যা করে।

শহীদ সাজদার রহমান ও তাঁর পরিবার ঃ সাজদার রহমান ছবির উদ্দিনের আত্মীয় ছিলেন। তাঁর ছেলে শাহাদাৎ হোসেন মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। ভারতে প্রশিক্ষণরত ছিলেন সে সময়। পারকোল আক্রমণ করলে হানাদার বাহিনীর হাতে সাজদার রহমান সহ পরিবারের ৬ জন সদস্য প্রাণ হারান।

১.সাজদার রহমান, ২. আদরী খাতুন (সাজদার এর স্ত্রী), ৩. আনজেরা (সাজদার এর কন্যা), ৪.আসিয়া (সাজদার এর কন্যা), ৫.আবু তালেব (পিতা: আহাদ আলী)(আনজেরার পুত্র) এবং ৬.আছের উদ্দিন (সাজদার এর নাতি)।

পাঁচবাড়িয়া গণহত্যা

পারকোল গ্রামের পার্শ্ববর্তী গ্রাম পাঁচবাড়িয়া, হানাদার বাহিনী ও ঘাতক-দালালরা এ গ্রামেও লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করে এবং হত্যাযজ্ঞ চালায়। এ গ্রামের প্রায় ৯-১০ জন মানুষকে হত্যা করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী। সারাদিন তান্ডব চালায় হানাদাররা।

কালিকাপুর গণহত্যা

১নং জোয়াড়ী ইউনিয়নের অন্তর্গত কালিকাপুর গ্রাম। এটি নাটোর-বড়াইগ্রাম রোডের পার্শ্বে অবস্থিত। এখানে ৪ জন অজ্ঞাত পরিচয়ধারী শহীদদের গণকবর রয়েছে। এছাড়া এখানে আরও বহু মানুষদের হত্যা করা হয়েছে বলে জানা যায়। সকলকে একসাথে এখানে কবর দেয়া হয়েছে। রোডের পাশে গণহত্যার শিকার শহীদদের গণকবরের উপর নির্মিত কালকাপুর স্মৃতিসৌধটি শহীদদের স্মৃতি রক্ষার্থে নির্মিত।

নটাবাড়িয়া কালির ঘুন গণহত্যা

মাঝগাঁও ইউনিয়নের নটাবাড়িয়া কালির ঘুন নামক স্থানে (মে মাসের শেষ দিকে) বিশ্বনাথ চাকী ও সুশীল পালকে গুলি করে হত্যা করে। তাদের ঠিকানা জানা যায়নি। তবে জোয়ারি ইউনিয়নের বাড়ি। উল্লেখ্য, মে মাসের শেষ দিকে পাকিস্তানি দালালেরা হানাদার বাহিনীকে জোয়ারি ইউনিয়নে নিয়ে যায় পথ চিনিয়ে। গ্রামে ঢুকেই তারা এলোপাথাড়ি গুলি করতে শুরু করে। গ্রামের লোকজন গুলির শব্দ শুনেই প্রাণভয়ে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পালাতে থাকে। এসময় পালাতে গিয়ে সিধু চাকী ও সুশীল পাল প্রাণভয়ে দৌড়ে পালাতে গিয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সামনে পড়ে যান। পাকিস্তানিরা যতোই তাদের নির্দেশ করে, 'ঠ্যারো, হিঁয়াছে ধারো', ওঁরা ততোই দ্রুত পালাতে থাকেন। না থামলে পাকিস্তানিরা পেছন থেকে ওঁদের লক্ষ্য করে গুলি করে(সুজিত সরকার ২০০৯ :১৯৪-১৯৫)। তাঁরা মাঁঝগাঁও ইউনিয়নের নটাবাড়িয়া কালির ঘুন নামক স্থানে তাঁরা গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। এরপর তাঁদের ট্রাক চাপা দিয়ে যায় হানাদাররা। তাঁদের সৎকারে পাকিস্তানি দালালরা বাধা দিয়েছে, তবে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিল বলে পরে অনুমতি দিলে সৎকার করা হয় ঘটনাস্থলেই। একসাথে কবর দেয়া হয় তাঁদের দু'জনকে(সুজিত সরকার ২০০৯ : ১৯৫)।

হারোয়া গণহত্যা

২০ এপ্রিল ১৯৭১ সালে মিলিটারিরা বনপাড়ার আশেপাশে আসে এবং বিক্ষিপ্তভাবে গোলাগুলি চালালে ৪ জন লোক মারা যায়। যতীন্দ্রনাথ পাল, পঞ্চানন দত্ত, রথীকান্ত দাস, দশ-এগারো বছরের বালক হরেন্দ্রনাথ দাস গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান(সুজিত সরকার ২০০৯ : ১৯৩)। ফণীভূষণ ভট্টাচার্য নামক একজন ঠাকুর আহত হন। তাঁকে বনপাড়া মিশন হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সেখানেও দালালরা খোঁজ খবর নিতে থাকে। তবে প্রাণে বেঁচে যান ফণীভূষণ ঠাকুর।

বনপাড়া মিশন গণহত্যা

বড়াইগ্রাম উপজেলার বনপাড়া পৌরসভায় অবস্থিত বনপাড়া রোমান ক্যাথলিক মিশন। নাটোর থেকে মিশনের দূরত্ব তেরো মাইল। নাটোর থেকে পাবনা যাওয়ার পথেই এই রোমান ক্যাথলিক মিশন। ১৯৭১ সালের ২ মে অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত, নিরাশ্রয় একদল নারী-পুরুষ শিশু এই বনপাড়া রোমান ক্যাথলিক মিশনে আশ্রয় নিয়েছিলো। একরাত এখানে কাটিয়ে পরদিন শুধু প্রাণটুকু বাঁচাতে ভারতের পথে পাড়ি দেবে তারা (সুকুমার বিশ্বাস ২০০০ : ১৩৫)। উল্লেখ্য, ২ মে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের কারণে তারা ভারতের পথে পাড়ি দিতে পারেনি (স্মরণিকা ২০০২ : ৩৩)।

৩ মে বিকাল সাড়ে তিনটার সময় মিশনের ফাদার লক্ষ্য করলেন যে, মিশন হাসপাতালের চারিদিকে মিলিটারীরা ঘিরে নিয়েছে। তার কিছুক্ষণ আগে বনপাড়া সংলগ্ন অন্যান্য গ্রাম থেকে খৃষ্টান পুরুষদেরকে ধরে নিয়ে এসেছে। অভিযান পরিচালনা করেছিল মেজর শেরওয়ানী। পরে ফাদারের সুপারিশে সমস্ত খৃষ্টানদেরকে নরপশুরা ছেড়ে দেয় (স্মরণিকা ২০০২ : ৩৩)। পাঞ্জাব রেজিমেন্টের কুখ্যাত মেজর শেরওয়ানী দালালদের মাধ্যমে খবর পেয়েছিলো যে, বনপাড়া খ্রিশ্চিয়ান মিশনে অসংখ্য হিন্দু পরিবারের সদস্য আশ্রয় নিয়েছে। তাদের সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাও রয়েছেন বলে তাদের ধারনা(সুজিত সরকার২০০৯ : ১৮৬-১৮৭)। মাঝপাড়া ইউনিয়নের সে সময়ের চেয়ারম্যান রকিবুল্লাহ মৃধা, আহমেদপুরের আব্দুল মজিদের মাধ্যমে নাটোরের কুখ্যাত জল্লাদ হাফেজ আবদুর রহমান ঐ খবরটি পেয়েছিল এবং মেজর শেরওয়ানীকে জানিয়েছিল(সুজিত সরকার২০০৯ : ১৮৬-১৮৭)।

মেজর শেরওয়ানী ও হাফেজ আবদুর রহমান একটি জিপে করে মিশনের গেইটে গিয়ে থামলো। মিশনের ধর্মযাজক ফাদার পিনোস ও গ্যাবলিব ভেতর থেকে বেরিয়ে মিশন দরজার কাছে গেলেন। এঁদের দু'জনকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই ক্রুদ্ধস্বরে মেজর বলে উঠলো, 'তোমরা ভারতের দালালি করছো। পাকিস্তানের শত্রুদের আশ্রয় দিয়েছো। বিনা বাধায় আশ্রিত সবাইকে আমাদের হাতে তুলে না দিলে বলপ্রয়োগ করতে বাধ্য হবো।' মিশনের ধর্মযাজক অনেক বুঝিয়ে মেজরকে শান্ত করতে চাইলেন। তাঁরা সহায়সম্বলহীন আশ্রিতদের প্রাণ ভিক্ষা চাইলেন। হানাদারদের পায়ে লুটিয়ে পড়লেন, কিন্তু কোনো কথাই তারা শুনলো না। শেষ পর্যন্ত কেবল নারী ও শিশুদের রেহাই দেবার অনুরোধ জানালেন। কিন্তু তাতেও হায়েনারা রাজি হলো না। শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানি সেনা ও তাঁদের সহযোগীরা গির্জার ভেতর ঢুকে পড়ে। তারা গির্জা অপবিত্র করলো(সুকুমার বিশ্বাস ২০০০ : ১৩৬)। নরপশুরা মিশনের অফিস, স্কুল ঘর, মহিলা হোস্টেল তল্লাশী করে আওয়ামী সমর্থক ও হিন্দুদেরকে খুঁজতে থাকে(স্মরণিকা ২০০২ : ৩৩)।

মিশনের দোতলার দক্ষিণাংশে ছিলো ছাত্রী নিবাস। আশ্রিতরা এই ছাত্রী নিবাসেই ঠাঁই নিয়েছিলো। সর্বস্ব হারিয়ে কেবল প্রাণটুকুর জন্য এখানে এসেছিল। বাঁচতে চেয়েছিলো ওরা। কিন্তু বাঁচতে দেওয়া হয়নি। পাকিস্তানি সেনারা মিশনের ভেতর ঢোকার পর আশ্রিতরা ভয়ে শঙ্কায় ছুটাছুটি করছিলো। কান্নার রোল পড়ে গেল। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য পুরুষদের বাঁচাও বাঁচাও চিৎকার, শিশুদের, নারীদের আর্ত চিৎকার সমগ্র মিশন এলাকাকে করে তুলেছিলো যন্ত্রণাকাতর। এই ভয়াল যন্ত্রণাকাতর দৃশ্যে ফাদার ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। আবারো মেজর শেরওয়ানীর কাছে নতজানু হয়ে আশ্রিতদের প্রাণভিক্ষা চাইলেন। কিন্তু বৃথা

আবেদন। পাকিস্তানি মেজর বা হাফেজ আব্দুর রহমান কেউই ফাদারের কথায় কান দিল না। ঝাঁপিয়ে পড়লো তারা অসহায় নারী পুরুষ শিশুদের ওপর। বুলেট, লাথি, রাইফেলের বাঁট আর বেয়োনেটের খোঁচায় আশ্রিতদের প্রায় মুমূর্ষু অবস্থায় সবাইকে বেঁধে ফেললো। এ সময় কয়েকজন পুরুষ মিশনের দেয়াল টপকে পালাবার চেষ্টা করে। কিন্তু দেয়ালের চারদিকেই ছিলো হানাদাররা প্রস্তুত। ধরে ফেললো তাদের। বেয়োনেটের আঘাতে রক্তাক্ত হলো তাদের দেহ। এভাবে দেয়াল টপকে পালাতে গিয়ে ২০ জন পুরুষ ধরা পড়েছিলো। এদের কয়েকজন বেয়োনেটের আঘাতে তাৎক্ষণিকভাবে মৃত্যুবরণ করে(সুকুমার বিশ্বাস ২০০০ : ১৩৬)। গুলি লেগে নিহত হন যতীন্দ্রনাথ পাল, অধীরচন্দ্র সাহা ও পঞ্চানন মিত্র। আহতাবস্থায় হানাদারেরা ধরে ফেলে মানিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মদনকুমার পাল আর অক্ষয় কুমার পালকে (সুজিত সরকার ২০০৯ : ১৮৭)।

বন্দীদের পরনের কাপড় ছিঁড়েই তাদের হাত ও চোখ বাঁধা হলো। তারপর তাদেরকে তিনটি ট্রাকে তোলা হলো। ট্রাক তিনটি বন্দীদের নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেল। এসময়ে মিশনের উত্তরাংশের ছাত্রাবাসে তিন জন শিক্ষক অবস্থান করছিলেন। তাঁরা বেঁচে গেলেন। এদের মধ্যে একজন হলেন গৌরপদ মন্ডল। মিশনের অপর দুই সিস্টারও রান্নাঘরের প্যাকিং বাক্সের মধ্যে নিজেদের লুকিয়ে রেখে প্রাণে বেঁচেছিলেন। এই অমানুষিক পৈশাচিক দৃশ্যে ফাদার গ্যাবলিব মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলেন। এই ধর্মযাজককে পরবর্তীতে ইটালির একটি মানসিক হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

ফাদার পিনোস গোটা ন'মাসই ছিলেন মিশনে । পাকিস্তানিরা তাঁর ওপর খুবই নাখোশ ছিল। পাঞ্জাব রেজিমেন্টের ব্রিগেডিয়ার নঈম তাঁকে একবার নাটোরে ডেকে পাঠিয়েছিল। ব্রিগেডিয়ার নঈম সেদিন ফাদারকে বলেছিলেন, 'আপনি মুক্তিবাহিনীকে আমাদের ধ্বংসসাধনে সাহায্য করছেন। ভবিষ্যতে কোন রাষ্ট্রদ্রোহীকে মিশনে আশ্রয় দিলে আপনাকে হত্যা করা হবে। গোটা মিশন মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হবে।' ফাদার চুপ করে সব শুনেছিলেন। এই হুঁশিয়ারির পরও তিনি গোটা মুক্তিযুদ্ধের সময় নির্যাতিত, সহায়-সম্বলহীন অসংখ্য নারী-পুরুষ, শিশুকে তার মিশনে আশ্রয় দিয়েছিলেন, নিরাপদে ভারতে চলে যেতে সাহায্য করেছিলেন(সুকুমার বিশ্বাস ২০০০ : ১৩৬-১৩৭)।

উল্লেখ্য, বনপাড়া মিশন থেকে ৩রা মে ৮৬জনকে ধরে নিয়ে নাটোর সদরের ফতেঙ্গাপাড়া গ্রামে রামপুরা খালের কাছে হত্যা করে হানাদার বাহিনী ও দালালরা। এরপর তাদের লাশগুলো গর্ত খুঁড়ে মাটি চাপা দিতে স্থানীয়দের বাধ্য করে। এরপরও ৬ জনকে এ এলাকা থেকে ধরে নিয়ে যায় নাটোরে। তারাও ফিরে আসেনি।

অন্যান্য গণহত্যা

এপ্রিলের ২৭ তারিখ মুক্তিযোদ্ধা সন্দেহে বনপাড়া থেকে ইমরান আলী (গ্রাম সভাপতি, আওয়ামী লীগ), শাহ্জালাল আলী (কৃষক), আফাজ উদ্দিন (কৃষক), ফকির উদ্দিন মোল্লা (কৃষক) ও আহম্মদপুরের নারায়ণ পালের পুত্রকে ধরে নিয়ে গিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে। অনিল পিউরিফিকেশন নামে আরেকজন ব্যক্তিকে মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের পর পরই পরাজিত বিহারিরা গোপালপুরে হত্যা করে। এপ্রিলের শেষের দিকে অধীরচন্দ্র সাহা আর আন্তন বিশ্বাসকে পাকিস্তানি বাহিনী হত্যা করে। শহীদ ইয়াদ আলীর বাড়ি দোগাছি

গ্রামে। পিতা আব্দুল কাদের প্রামাণিক। ১৯৬৭ সালে জি,আর,পিতে যোগ দেন। ১৯৭১ সালে হাবিলদার পদে পদোন্নতি পেয়ে লালমনিরহাট বিভাগীয় রেলওয়ে অফিসে যোগদান করেন। সেখানে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের দ্বারা উৎসাহিত হন ও যুবকদের প্রশিক্ষণ দেন। যুদ্ধ শুরু হলে স্ত্রী-সন্তানদের নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠালেও নিজে বাড়িতেই থেকে যান। অবাঙালি খুনিরা তাঁকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে।

এছাড়া আরও বহু স্থানে বহু মানুষ মারা যায়। যেমন- শহীদ মুক্তিযোদ্ধা আক্কাস আলী, শহীদ আব্দুল আজিজ, শহীদ আবু রায়হান, শহীদ ইয়াদ আলী, শহীদ শাহাদাৎ হোসেন প্রমূখদের অনেককেই পাকিস্তানি বাহিনী ধরে নিয়ে নির্যাতন করে হত্যা করেছে। এরপর কোথায় তাদের ফেলেছে, তা কেউ আজও জানে না।

বধ্যভূমিও গণকবর

১৯৭১ সালে বড়াইগ্রাম উপজেলার বিভিন্ন স্থানে অনেক মানুষ গণহত্যার শিকার হয়েছিলেন যার নিদর্শনস্বরূপ এ অঞ্চলে অনেক গণকবরও বধ্যভূমি সাক্ষী হিসেবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও দালালরা এ উপজেলাতেও বহু মানুষকে হত্যা করে বিভিন্ন স্থানে ফেলে রেখেছিল। ফলে এ উপজেলাতেও রয়েছে গণকবর। নিম্নে সেগুলোর বর্ণনা দেয়া হলো ঃ

কালিকাপুর বধ্যভূমি

১নং জোয়াড়ী ইউনিয়নের অন্তর্গত কালিকাপুর গ্রাম। এখানে ৪ জন অজ্ঞাত পরিচয়ধারী শহীদদের গণকবর রয়েছে। এছাড়া এখানে আরও বহু মানুষদের হত্যা করা হয়েছে বলে জানা যায়। বড়াইগ্রাম-ঢাকা রোডের পাশে এ বধ্যভূমির উপর একটি স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়েছে।

নটাবাড়িয়া কালির ঘুন গণকবর

জোয়াড়ি ইউনিয়ন ২জন ব্যক্তি সুশীল ও বিশ্বনাথকে এখানে কবর দেয়া হয়েছে। স্থানীয় উদ্যোগে চারদিকে বেষ্টনী তৈরি করা আছে। এ এলাকাটি মাঝগাঁও ইউনিয়নের অন্তর্গত।

পারকোল গণকবর

৪নং নগর ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত পারকোল গ্রামে প্রায় ২১ জনের লাশ একসাথে কবর দেয়া হয়েছে। পারিবারিক উদ্যোগে একটি বেষ্টনী দেয়া আছে।

ধানেদাহ গণকবর

নগর ইউনিয়নের ধানাইদহ ব্রিজের নিচে গণকবর রয়েছে। ধানাইদহ ব্রিজ প্রতিরোধে স্থানীয় জনগণ ও ই.পি.আর সদস্য প্রাণ হারায়। তাদের সকলকে এখানে একসাথে কবরস্থ করা হয়। এটি ধানাইদহ ব্রিজের পাশে অবস্থিত। ধানাইদহ ব্রিজ প্রতিরোধের যুদ্ধে শহীদদের গণকবরের উপর নির্মিত হয়েছে স্মৃতিস্তম্ভ।

মূল্যায়ন

১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসররা বড়াইগ্রাম উপজেলায় এপ্রিল থেকে নভেম্বর মাসে প্রায় ১০০-১৫০ মানুষকে হত্যা করেছে হানাদাররা। এ উপজেলায় গণহত্যার কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়-

প্রথমত, হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষ গণহত্যার শিকার হন।

দ্বিতীয়ত, গণহত্যায় ই.পি.আর সদস্যরা শহীদ হন।

তৃতীয়ত, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসররা মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগী বলে সন্দেহ করে সাধারণ মানুষদের এবং প্রতিরোধকারীদের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে গণহত্যা চালিয়েছিল পারকোল-পাঁচবাড়িয়া এলাকায়।

চর্তুথত, বনপাড়া মিশনের আশ্রিত নিরীহ মানুষও গণহত্যার শিকার হন।

১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল হানাদার বাহিনী বড়াইগ্রাম উপজেলায় প্রবেশ করে। তারা ১১ এপ্রিল ধানাইদহ ব্রিজ এ স্থানীয়দের প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। স্থানীয় জনগণ বীরত্বের সাথে লড়াই করে। এদের মধ্যে অনেকে প্রাণ হারায়। এরপর দালাল রাজাকার আলবদর আলশামস বাহিনীর সহায়তায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী পুরো বড়াইগ্রাম দখল করার চেষ্টায় রওনা হয়। তারা জানতে পারে যে স্থানীয় জনগণ মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করেছে বা করছে। এতে ঘাতকরা বিভিন্ন এলাকা আক্রমণ করে লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, হত্যা, নির্যাতন চালায়। তারা বড়াইগ্রামের প্রায় ৮টি স্থানে গণহত্যা চালায়। শিশু-বৃদ্ধ-মহিলা-পুরুষ কেউই তাঁদের শিকার থেকে বেঁচে ফেরেনি। এপ্রিল থেকে নভেম্বর মাসে প্রায় ১০০-১৫০ মানুষকে হত্যা করেছে হানাদাররা। নির্যাতন করেছে বহু নারীদের। বনপাড়া খ্রিষ্টান মিশনে আশ্রিতদের ধরে নিয়ে হত্যা ও নির্যাতন করেছে। এতকিছুর পরও বাঙালির মনোবল অটুট থেকেছে। বিজয় অর্জন করেছে। ৩০ নভেম্বরের দিকে এ উপজেলায় অত্যাচারের মাত্রা কমে আসে। হানাদারদের সংখ্যাও কমে আসতে থাকে। মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ জনগণের প্রচেষ্টায় ১৫ ডিসেম্বর বড়াইগ্রাম উপজেলাটি হানাদার মুক্ত হয় পুরোপুরি।

উপসংহার

১৬ ডিসেম্বর থেকে এ এলাকার মানুষও বিজয়ের আনন্দে আনন্দিত হয়েছে। ২১ ডিসেম্বর নাটোরে আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে গৌরবময় বিজয় অর্জন করেছে। কিন্তু বিজয়ের আনন্দ ম্লান হয়েছে গণহত্যার চিত্র দেখে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় সহযোগী যেমন-রাজাকার, আলবদর, আলশামস্‌দের হাতে অনেক মানুষ নিহত হয়েছেন যার সংখ্যা ৩০ লক্ষের বেশি। নাটোর জেলায় বড়াইগ্রাম উপজেলার উপর জরিপ প্রমাণ করে ৫৫ হাজার বর্গমাইল এলাকায় গণহত্যার চিত্র কত ব্যাপক। গবেষণাকর্মটি পরিচালনা করতে গিয়ে কালিকাপুর গণহত্যা সম্পর্কে সর্বপ্রথম জানা গিয়েছে। অন্যকোন গ্রন্থে এ সম্পর্কে জানা যায় না।

সহায়ক গ্রন্থ

ফজলুর রহমান (২০০০)। *বাংলাদেশের গণহত্যা*, শিখা প্রকাশনী, ঢাকা।
সাঈদ বাহ্‌াদুর(২০০৭)। *গণহত্যা ও বধ্যভূমি ৭১[১ম খন্ড]*, মুক্তচিন্তা, ঢাকা।
সুকুমার বিশ্বাস (২০১০)। *একাত্তরের বধ্যভূমি ও গণকবর*, অনুপম, ঢাকা।

সুজিত সরকার (২০০৯)। *নাটোর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, গতিধারা, ঢাকা।

গ্রাম জনসংখ্যা পরিসংখ্যান (১৯৭৪), বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

সম্পাদিত গ্রন্থ

আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পা.)(২০১০)। *মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস দ্বিতীয় খন্ড*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সেনাসদর (২০০৮)। শিক্ষা পরিদপ্তর, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, (৬ষ্ঠ খণ্ড), এশিয়া পাবলিকেশনস্, ঢাকা।

মুনতাসীর মামুন (সম্পা.)(২০১৩)। *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, দ্বিতীয় খণ্ড, সময়, ঢাকা।

সিরাজুল ইসলাম (প্রধান সম্পাদক)(২০১১)। *বাংলাপিডিয়া*,১ম-১০ম খন্ড, *বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.)(১৯৮৪)। *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিলপত্র:* অষ্টম খণ্ড, হাক্কানী পাবলিশার্স, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

স্মরণিকা / সাময়িকী

শাহরিয়ার কবির (২০১৫)। *শহীদ স্মারক বক্তৃতা-১, বাংলাদেশের গণহত্যা, আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও বিচার*, ১৯৭১ গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট, ঢাকা।

স্মরণিকা(২৬ মার্চ ২০০২)। *মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০০২*, জেলা প্রশাসন, নাটোর।

ব্যবহৃত ওয়েবসাইট

নাটোর জেলা বাতায়ন (http://baraigram,natore.gov.bd)

(http://majgaonup.natore.gov.bd)

(http://nagorup.natore.gov.bd)

(http://gopalpurup.natore.gov.bd)

(http://baraigramnatore.gov.bd)

সাক্ষাৎকার

আব্দুল জলিল সরকার (৫২), পিতা: মজির উদ্দিন সরকার, গ্রাম: পারকোল, ইউনিয়ন: নগর, উপজেলা: বড়াইগ্রাম, জেলা: নাটোর। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: নিজবাড়ি, ২২ জুলাই ২০১৫।

রহিম বক্স (৬৫), পিতা: মজের বক্স, মৌজা: নটাবাড়িয়া, ইউনিয়ন: মাঝগাঁও। উপজেলা: বড়াইগ্রাম, জেলা: নাটোর। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: নিজবাড়ি, ২২ জুলাই ২০১৫।

মুক্তিযোদ্ধা মোঃ শামসুল হক (৬৭), পিতা: কিফর উদ্দিন, উপজেলা: বড়াইগ্রাম, জেলা: নাটোর। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ বড়াইগ্রাম, ২২ জুলাই ২০১৫।